

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৯

সূরা আশ-শাম্স

সূরা আশ-শাম্স কুরআনের ৯১ তম সূরা, এর আয়াত সংখ্যা ১৫টি এবং এর রুকুর সংখ্যা ১টি। আশ-শাম্স সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আশ-শাম্স শব্দের অর্থ সূর্য।

নামকরণ :

সূরার প্রথম শব্দ আশ শামসকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময় কাল :

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে জানা যায়, এ সূরাটিও মক্কা মু'আযযমায় প্রথম যুগে নাযিল হয়। কিন্তু এটি এমন সময় নাযিল হয় যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা তুংগে উঠেছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য :

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, সৎ ও অসৎ নেকী ও গোনাহর পার্থক্য বুঝানো এবং যারা এই পার্থক্য বুঝতে অস্বীকার করে আর গোনাহর পথে চলার ওপরই জোর দেয় তাদেরকে খারাপ পরিণতির ভয় দেখানো।

মূল বক্তব্যের দিক দিয়ে সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি শুরু হয়েছে সূরার সূচনা থেকে এবং ১০ আয়াতে গিয়ে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগটি ১১ আয়াত থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে।

প্রথম অংশে তিনটি কথা বুঝানো হয়েছে।

এক - সূর্য ও চন্দ্র, দিন ও রাত, পৃথিবী ও আকাশ যেমন পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী, ঠিক তেমনি সৎ ও অসৎ এবং নেকী ও গোনাহও পরস্পর ভিন্ন এবং প্রভাব ও ফলাফলও এক হতে পারে না।

দুই- মহান আল্লাহ মানবাত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি শক্তি দিয়ে দুনিয়ায় একেবারে চেতনাহীনভাবে ছেড়ে দেননি বরং একটি প্রাকৃতিক চেতনার মাধ্যমে তার অবচেতন মনে নেকী ও গোনাহর পার্থক্য, ভালো ও মন্দের প্রভেদ এবং ভালোর ভালো হওয়া ও মন্দের হওয়ার বোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

তিন- মানুষের মধ্যে পার্থক্য বোধ, সংকল্প ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে শক্তিসমূহ আল্লাহ রেখে দিয়েছেন, সেগুলো ব্যবহার করে সে নিজের প্রবৃত্তির ভালো ও মন্দ প্রবণতাগুলোর মধ্য থেকে কাউকে উদ্দীপিত করে আবার কাউকে দাবিয়ে দেয়। এরি ওপর তার ভবিষ্যত নির্ভর করে। যদি সে সৎপ্রবণতাগুলোকে উদ্দীপিত করে এবং অসৎ প্রবণতাসমূহ থেকে নিজের নফসকে পবিত্র করে তাহলে সে সাফল্য লাভ করবে। বিপরীত পক্ষে যদি সে নফসের

সংপ্রবণতাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করতে থাকে এবং অসং প্রবণতাকে উদ্দীপিত করতে থাকে তাহলে সে ব্যর্থ হবে।

দ্বিতীয় অংশে সামুদ জাতির ঐতিহাসিক নজীর পেশ করে রিসারাতের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। ভালো ও মন্দের যে চেতনালব্ধি আলাহ মানুষের প্রকৃতিতে রেখে দিয়েছেন তা মানুষের সঠিক পথের সন্ধান লাভ করার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তাকে পুরোপুরি না বুঝার কারণে মানুষ ভালো ও মন্দের বিভ্রান্তিকর দর্শন ও মানদণ্ড নির্ণয় করে পথভ্রষ্ট হতে থাকে। তাই মহান আলাহ এই প্রকৃতিগত চেতনাকে সাহায্য করার জন্য আশিয়া আলাইহিমুস সালামদের ওপর সুস্পষ্ট এ দ্ব্যর্থহীন অহী নাযিল করেছেন। এর ফলে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে লোকদেরকে নেকী ও গোনাহ কি তা জানাতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যেই আলাহ দুনিয়ায় নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন। এই ধরনেরই একজন নবী ছিলেন হযরত সালাহ আলাইহিস সালাম। তাঁকে সামুদ জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সামুদরা তাদের প্রবৃত্তির অসংপ্রবণতার মধ্যে ডুবে গিয়ে বড় বেশী হুকুম অমান্য করার ভূমিকা অবলম্বন করেছিল। যার ফলে তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। তাদের মু'জিয়া দেখাবার দাবী অনুযায়ী তিনি তাদের সামনে একটি উঠনী পেশ করলেন। তাঁর সাবধান বাণী সত্ত্বেও এই জাতীয় সবচেয়ে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিটি সমগ্র জাতির ইচ্ছা ও দাবী অনুযায়ী উঠনীটিকে হত্যা করলো। এর ফলে শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতি ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেলো।

সামুদ জাতির এ কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে সমগ্র সূরার কোথাও একথা বলা হয়নি যে, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! যদি তোমরা সামুদদের মতো তোমাদের নবী মুহাম্মাদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রত্যাখ্যান করো তাহলে তোমরাও সামুদের মতো একই পরিণামের সম্মুখীন হবে। সালাহ আলাইহিস সালামের মোকাবেলায় সামুদ জাতির দুশ্চরিত্র লোকেরা যে অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিল মক্কায় সে সময় সেই একই অবস্থা বিরাজ করছিল। তাই এ অবস্থায় এই কাহিনী শুনিতে দেয়াটা আসলে সামুদদের এই ঐতিহাসিক নজীর কিভাবে মক্কাবাসীদের সাথে খাপ খেয়ে যাচ্ছে, তা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আগের সূরা ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

আগের সূরা আল বালাদ এর ১০ নম্বর আয়াতে দুটি সুস্পষ্ট ভিন্ন পথের কথা উল্লেখ রয়েছে। এবং ১৮ ও ১৯ নম্বর আয়াতে ই ২ পথের পথিকদের ২ টি (ডান ও বাম) পন্থী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঐ সূরার ৮ ও ৯ নম্বর আয়াতে সবারই চোখ, জিহবা ও ঠোঁট থাকার পরও কেন ভিন্ন ২ পথে তারা যায় তার বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এই সূরা (৯১ তম সূরা আশ শামছ) তে। মূলত নাফসের ২ টি ভিন্ন প্রবণতার কারনেই মানুষের পথ চলা ভিন্ন হয় যা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে আয়াত ৮ এ।

আগের সূরার শেষে ভুল পথে চলার পরকালীন পরিনতির কথা বলা হয়েছে (২০, শেষ আয়াত) এবং এই সূরার শেষ দিকে (আয়াত ১৪) বলা হয়েছে যে, (শুধু পরকালে নয়) দুনিয়াতেও এর পরিনতি ভয়াবহ।

এই সূরার ৯ নং আয়াতে নাফসের পরিশুদ্ধির কারনে সফলতার কথা বলা হয়েছে এবং পরের সূরায় সেই পরিশুদ্ধি কারীদের বৈশিষ্ট্য ও ফলাফল বর্ণিত হয়েছে (আয়াত ৫,৬,৭)। এই সূরার ১০ নং আয়াতে নাফসে সঠিকভাবে ব্যবহার না করার কারনে ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে এবং পরের সূরায় সেই ব্যর্থতার কারন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে ৮,৯ ও ১০ নম্বর আয়াতে।

এই সূরায় অবাধ্যতা, বিদ্রোহ পতনের অন্যতম কারন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে (আয়াত ১১) এবং পরের সূরায় অর্থ লোভ পতনের অন্যতম কারন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে (আয়াত ১১)।

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا

১. শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের

‘আমি শপথ করছি সূর্যের ও তার প্রভাতরশ্মির। এখানে দু’টি শপথ একসাথে করা হয়েছে। সূর্যের শপথ এজন্য যে, এটি একটি বিশাল সৃষ্টি, যা তাপ ও আলোর উৎস। অতঃপর তার কিরণের শপথ করা হয়েছে। কেননা তা জীবন ও জাগরণের উৎস। এর আগমনে মানুষ ও সৃষ্টিজগত ঘুম থেকে জেগে উঠে যার যার কাজে আত্মনিয়োগ করে। এর উদয়, উত্থান ও অস্তের সাথে দিবসে কর্মের সূচনা, ব্যস্ততা ও সমাপ্তির সম্পর্ক রয়েছে। তাই সৃষ্টিজগতের কর্মচাঞ্চল্যে সূর্যকিরণের অবদান সবচেয়ে বেশী। সেটির গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই আল্লাহ এখানে পৃথকভাবে ‘কিরণের’ শপথ করেছেন। যেদিন সূর্য আলোহীন হবে, সেদিন কিয়ামত হবে।

وَاو এখানে শপথসূচক অব্যয় হয়েছে। সূরার শুরুতে পরপর আটটি বড় বড় সৃষ্টবস্তুর শপথের মধ্যে প্রথম দু’টি হ’ল সূর্য ও তার কিরণের শপথ। এই শপথের মাধ্যমে সূর্য ও সূর্যরশ্মির গুরুত্ব ও মানবকল্যাণে তার অনন্য অবদানের প্রতি চিন্তাশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

ضُحَى বলতে মানে সূর্যের আলো ও তাপ দু’টোই। আরবী ভাষায় এর পরিচিত মানে হচ্ছে চাশতের সময়, যখন সূর্য উদয়ের পরে যথেষ্ট উপরে উঠে যায় কিন্তু উপরে ওঠার পরে কোন আলোই বেড়ে যায় না, তাপও বিকীরণ করতে থাকে। তাই ‘দুহা’ শব্দটি যখন সূর্যের সাথে সম্পর্কিত হয়, তখন তার আলো বা তার বদৌলতে যে দিনের উদয় হয় তা থেকে তার পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ হয় না। বরং এর তুলনায় রোদ শব্দটি তার সঠিক ও পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।

وَالْقَمَرَ إِذَا تَلَاهَا

২. শপথ চাঁদের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়

ثَعْنُ অর্থ ‘পিছে পিছে আসা’। সূর্য ডোবার সাথে সাথে চন্দ্র তার জ্যোতি নিয়ে বেরিয়ে আসে। বিশেষ করে শুক্লপক্ষে যা স্পষ্ট দেখা যায়।

‘সূর্যের পশ্চাতে আসে’ বলার মধ্যে বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসের সন্ধান দেওয়া হয়েছে যে, চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই। বরং সূর্য যখন পৃথিবীর আড়ালে চলে যায়, তখন তার কিরণ চন্দ্রের উপর প্রতিফলিত হয় বলেই তাকে আলোকিত দেখা যায়। আর তাই সূর্য কিরণের জ্বালা চন্দ্রের আলোয় থাকে না। সূর্য কিরণে প্রাণীদেহ ও বৃক্ষকুল শক্ত-সমর্থ হয়। পক্ষান্তরে চন্দ্রের প্রভাবে সাগর ও নদীতে জোয়ার-ভাটা হয়। সূর্য ও চন্দ্র তাই প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের সবচেয়ে বড় বন্ধু। এখানে চন্দ্রের শপথ করা হয়েছে রাত্রির নিদর্শন হিসাবে।

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰهَا

৩. শপথ দিনের, যখন সে সূর্যকে প্রকাশ করে

এখানে **جَلَّىٰهَا** এর সর্বনাম দ্বারা সূর্যও উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার অন্ধকার বা আঁধার দূর করাও বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ শপথ দিবসের, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে। অথবা যখন তা অন্ধকারকে আলোকিত করে দুনিয়াকে প্রকাশ করে। এর তৃতীয় অর্থ হতে পারে, শপথ সূর্যের, যখন তা পৃথিবীকে প্রকাশিত করে।

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا

৪. শপথ রাতের, যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে

সদা চলমান ও ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর যে অংশ যখন সূর্যের দিকে থাকে, তখন সে অংশে দিন হয় এবং অপর অংশে রাত হয়। ‘সূর্যকে ঢেকে দেয়’ অর্থ সূর্য থেকে পৃথিবী আড়ালে চলে যায়। সূর্য ওঠা, সূর্য ডোবা, সূর্য মাথার উপরে আসা প্রভৃতি কথার মধ্যে সূর্য ও পৃথিবী উভয়ে যে নিজ নিজ কক্ষপথে সদা চলমান, তার প্রমাণ বহন করে। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ উৎসের সন্ধান রয়েছে এই আয়াতে এবং অন্য আয়াতসমূহে। সূর্যের আসা-যাওয়া ও উত্তাপের কমবেশী হওয়া এবং রাত্রিতে হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর এক অপূর্ব পালন কৌশল। সূর্যতাপ সর্বদা একইরূপ থাকলে এবং দিবারাত্রির আগমন-নির্গমন না থাকলে পৃথিবী প্রাণীকুলের বসবাসের অযোগ্য হয়ে যেত।

বস্তুতঃ পৃথিবী অন্ধকারের চাদরে ঢেকে যাওয়ার এই সুন্দর দৃশ্য দেখা যায় চলমান বিমান থেকে। কেননা বিমান তখন সূর্যের আলোর মধ্যে থাকে। আর পৃথিবী থাকে অন্ধকারের পর্দার মধ্যে।

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَىٰهَا

৫. শপথ আকাশের ও তার নির্মাণের

এখানে দু’টিই অর্থ হতে পারে। ‘শপথ আকাশের ও তার নির্মাণের’। অথবা ‘শপথ আকাশের ও তার নির্মাতার’। দু’টি অর্থই পরস্পরের পরিপূরক। পূর্বাপর বিবেচনায় আমরা প্রথম অর্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। কেননা ‘নির্মাতা’ বলতে আল্লাহকে বুঝায়। অথচ আল্লাহ সাধারণতঃ সৃষ্টির কসম করে থাকেন। এখানেও আল্লাহ নিজের কসম না করে সৃষ্টির অর্থাৎ ‘নির্মাণের’ কসম করেছেন।

এই শপথের মাধ্যমে আকাশের বিশালত্ব ও তার অপূর্ব নির্মাণশৈলীর প্রতি চিন্তাশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সাথে সাথে বিজ্ঞানী বান্দাদের প্রতি মহাকাশ গবেষণায় নিয়োজিত হওয়ার ইঙ্গিত করা হয়েছে। আকাশ সৃষ্টির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ‘আর আসমানকে আমরা সৃষ্টি করেছি নিজ হাতে এবং আমরা অবশ্যই একে প্রশস্তকারী’ (যারিয়াত ৫১/৪৭)। আল্লাহ নিজ ক্ষমতাবলে সবই সৃষ্টি করেছেন। তা সত্ত্বেও আসমান সৃষ্টির বেলায় ‘নিজ হাতে’ বিশেষভাবে বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আকাশ একটি বিরাট সৃষ্টি।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আকাশের এই সৃষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। নিচে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো-

- ‘তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সাতটি আকাশ। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না। তুমি আবার তাকিয়ে দেখ, কোন খুঁত দেখতে পাও কি?’ ‘অতঃপর তুমি দু’বার করে দৃষ্টি ফিরাও। সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে’ (মূলক ৬৭/৩-৪)।
- ‘তারা কি তাদের উপরে অবস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, কিভাবে আমরা তা নির্মাণ করেছি ও সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোনরূপ ফাঁক-ফোকর নেই’ (ক্বাফ ৫০/৬)।
- অন্যত্র আল্লাহ হঠকারী মানুষকে লক্ষ্য করে বলছেন, ‘তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের সৃষ্টি? যা তিনি নির্মাণ করেছেন’। ‘তিনি একে উচ্চ করেছেন, অতঃপর তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন’ (নাযে’আত ৭৯/২৭-২৮)।
- পৃথিবীর উপরে আকাশকে নির্মাণ করেছেন ‘সুরক্ষিত ছাদ হিসাবে’ (আস্ফিয়া ২১/৩২)। প্রতিটি ছাদের মধ্যকার দূরত্ব কল্পনার অতীত। নিম্ন আকাশকে সাজিয়েছেন নক্ষত্ররাজি দ্বারা (মূলক ৬৭/৫)। যা অন্ধকার পৃথিবীকে আলোকিত করে এবং তা দেখে মানুষ অন্ধকারে পথ খুঁজে পায় (নাহল ১৬/১৬)।
- কতই না বিস্ময়কর এই আকাশ, যা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূমকুঞ্জ বিশিষ্ট (রহমান ৫৫/৩৫)
- ‘আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কত অগণিত নিদর্শন রয়েছে। তারা এসবের উপর দৃষ্টি ফেলে চলে যায়। কিন্তু তারা এগুলো থেকে বিমুখতা অবলম্বন করে (ইউসুফ ১২/১০৫)

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاها

৬. শপথ জমিনের এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তার

পৃথিবীকে আল্লাহ বিস্তৃত করেছেন বান্দার বসবাসের জন্য। পৃথিবীকে আল্লাহ নরম কাদার মত করেননি। আবার শক্ত পাথরের মত করেননি। বরং মধ্যম মানের সমভূমি করে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তা বান্দার কল্যাণে ব্যবহৃত হ’তে পারে। কোন কোন স্থান নরম ও শক্ত হ’লেও সেটা পৃথিবীর স্বাভাবিক গঠন নয়। উল্লেখ্য যে, এই আয়াত দিয়ে ‘পৃথিবী গোলাকার নয়’ প্রমাণের কোন অবকাশ নেই। পৃথিবী নিঃসন্দেহে গোলাকার। তবে তার বিস্তৃতি এমনভাবে ঘটানো হয়েছে যে, আকারে গোল হ’লেও ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীরা কেউ পৃথিবী ছেড়ে ছিটকে পড়ে যায়। পৃথিবীর বিস্তৃতিকে অন্য আয়াতে (নাবা ৭৮/৬) বিছানার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে আপেক্ষিক অর্থে, প্রকৃত অর্থে নয়। আমাদের জন্য পৃথিবী বিছানা সদৃশ সমতল ভূমি হ’লেও প্রকৃত অর্থে পৃথিবী গোলাকার। আলোচ্য আয়াতে পৃথিবীকে বিস্তৃত করা হয়েছে বলে তার দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তব অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে।৭

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا

৭. শপথ মানুষের ও তার বিন্যস্ত করণের

হাত-পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মস্তিষ্ক ইত্যাদিসহ সুন্দর অবয়ব দিয়ে বিন্যস্ত করে যে মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, তার শপথ। এই শপথের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে তার নিজের সৃষ্টিকৌশল সম্পর্কে চিন্তা করার প্রতি ইঙ্গিত

করেছেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ‘(তিনিই সেই সত্তা) যিনি তাঁর প্রত্যেক সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন’। ‘অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে’। ‘অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রুহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন চক্ষু, কর্ণ ও অন্তঃকরণ। (অথচ) তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক’ (সাজদাহ ৩২/৭-৯)।

ফেরাউন যখন বলেছিল ‘হে মূসা! তোমাদের প্রতিপালক কে?’ জবাবে মূসা বলেছিলেন, ‘আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তাকে পথপ্রদর্শন করেছেন’ (ত্বোয়াহা ২০/৪৯-৫০)। এই পথপ্রদর্শন দু’ভাবে হ’তে পারে। এক- প্রত্যেকের পৃথক পৃথক আকৃতি এবং তার কর্ম ও আচরণ। যেমন মানুষ ও অন্য প্রাণীর আচরণ। দুই- নৈতিক পথপ্রদর্শন যা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। আলোচ্য আয়াতে প্রথমটির অর্থ অধিকতর স্পষ্ট।

فَاللَّهُمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

৮. তারপর তাকে তার সৎকাজের এবং তার অসৎ-কাজের জ্ঞান দান করেছেন

‘জ্ঞানদান করা’র এক অর্থ এই যে, তিনি তাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে আশ্বিয়াগণ ও আসমানী কিতাব দ্বারা ভাল-মন্দ চিনিয়ে দিয়েছেন। অথবা এর অর্থ যে, তার মস্তিষ্ক ও প্রকৃতিতে ভাল-মন্দ, নেকী-বদীর অনুভূতি প্রদান করেছেন। যাতে সে নেকীর পথ অবলম্বন করে এবং বদীর পথ হতে দূরে থাকে।

একথাটিই অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে, “আর আমরা ভালো ও মন্দ উভয় পথ তার জন্য সুস্পষ্ট করে রেখে দিয়েছি।” [সূরা আল-বালাদ: ১০] আবার কোথাও বলা হয়েছে, “আমরা তাদেরকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাইলে তারা কৃতজ্ঞ হতে পারে আবার চাইলে হতে পারে অস্বীকারকারী।” [সূরা আল-ইনসান: ৩] একথাটিই অন্যত্র বলা হয়েছে এভাবে, “অবশ্যই আমি শপথ করছি নাফস আল-লাওয়ামার” [সূরা আল-কিয়ামাহ: ২] সুতরাং মানুষের মধ্যে একটি নাফিসে লাওয়ামাহ (বিবেক) আছে। সে অসৎকাজ করলে তাকে তিরস্কার করে। আরও এসেছে, “আর প্রত্যেক ব্যক্তি সে যতই ওজর পেশ করুক না কেন সে কি তা সে খুব ভালো করেই জানে।” [সূরা আল-কিয়ামাহ: ১৪-১৫]

فَذُفِّلَحْ مَنْ زَكَّاهَا

৯. সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে।

পূর্বোক্ত শপথগুলোর জওয়াবে এ আয়াতগুলোয় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে, (فَذُفِّلَحْ مَنْ زَكَّاهَا) এখানে, (فَذُفِّلَحْ) শব্দটি تَزَكَّى থেকে। এর প্রকৃত অর্থ পরিশুদ্ধতা; বুদ্ধি বা উন্নতি। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজের নফস ও প্রবৃত্তিকে দুষ্কৃতি থেকে পাক-পবিত্র করে, তাকে সৎকাজ ও নেকির মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ ও উন্নত করে পবিত্রতা অর্জন করে, সে সফলকাম হয়েছে।

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

১০. আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।

পূর্ববর্তী আয়াতের تَزَكِيَةً এর মোকাবেলায় বলা হয়েছে, دَسَّاهَا এর শব্দমূল হচ্ছে نَدَسَّيْسُ। যার মানে হচ্ছে দাবিয়ে দেয়া, লুকিয়ে ফেলা; পথভ্রষ্ট করা। পূর্বাপর সম্পর্কের ভিত্তিতে এর অর্থও এখানে সুস্পষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই ব্যর্থ, যে নিজের নাসফসকে নেকী ও সৎকর্মের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করার পরিবর্তে দাবিয়ে দেয়, তাকে বিভ্রান্ত করে অসৎপ্রবণতার দিকে নিয়ে যায়।

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا

১১. সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত মিথ্যারোপ করেছিল।

পূর্বের আয়াতে ব্যর্থ মনোরথ এবং পাপে ডুবে যাওয়া লোকদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ এখানে বিগত দিনের দুর্ধর্ষ ও ক্ষমতাশালী জাতি ছামূদ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা সালেহ আলাইহিস সালামের নবুওয়াতকে মিথ্যা গণ্য করলো। তাদেরকে হেদায়াত করার জন্যে সালেহকে পাঠানো হয়েছিল। যে দুষ্কৃতিতে তারা লিপ্ত হয়েছিল তা ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত ছিল না এবং সালেহ আলাইহিস সালাম যে তাকওয়ার দিকে তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন তা গ্রহণ করতেও তারা চাইছিল না। নিজেদের এই বিদ্রোহী মনোভাব ও কার্যক্রমের কারণে তাই তারা তার নবুওয়াতকে মিথ্যা বলছিল।

إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا

১২. তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল,

অর্থাৎ দুই যুবকটি নবীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আল্লাহ প্রেরিত উম্মীর পা কেটে দিয়েছিল। অবাধ্য কওমের দাবী অনুযায়ী নবী সালেহ (আঃ)-এর প্রার্থনা মতে আল্লাহ স্বীয় নিদর্শন হিসাবে বড় একটি উম্মী পাঠিয়েছিলেন, যে একদিন কূয়ার সব পানি খেয়ে নিত ও একদিন তাদের দুধ দিত। যা তাদের সকলের চাহিদা মিটাতে। কিন্তু দুই নেতারা চক্রান্ত করে উম্মীর পা কেটে হত্যা করে ফেলে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যাম'আহ (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খুৎবার মধ্যে অত্র আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন যে, হত্যাকারী ঐ লোকটি তার সম্প্রদায়ের একজন পরাক্রমশালী সর্দার ছিল আবু যাম'আহর ন্যায়'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, ঐ লোকটি ছিল কঠোর হৃদয় ও দুশ্চরিত্র।

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا

১৩. তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বললেন, আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর বিষয়ে সাবধান হও।

কুরআন মজীদে অন্যান্য স্থানে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সামুদ জাতির লোকেরা সালেহ আলাইহিস সালামকে বলে দিয়েছিল যে, যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে কোন নিশানী (মু'জিয়া) পেশ করো। একথায় সালেহ আলাইহিস সালাম মু'জিয়া হিসেবে একটি উটনী তাদের সামনে হাযির করেন, তিনি বলেনঃ এটি আল্লাহর উটনী। যমীনের যেখানে ইচ্ছা সে চরে বেড়াবে। একদিন সে একা সমস্ত পানি পান করবে এবং অন্যদিন তোমরা সবাই ও তোমাদের পশুরা পানি পান করবে। যদি তোমরা তার গায়ে হাত লাগাও তাহলে মনে রেখো তোমাদের ওপর কঠিন আযাব বর্ষিত হবে। একথায় তারা কিছুদিন পর্যন্ত ভয় করতে থাকলো। তারপর তারা তাদের সবচেয়ে হতভাগা লোককে ডেকে একমত হলো এবং বলল, এই উটনীটিকে শেষ করে দাও। সে এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলো। [দেখুন: সূরা আল-আ'রাফঃ ৭৩, আশ-শু'আরাঃ ১৫৪-১৫৬ এবং আল-ক্বামারঃ ২৯]

আল্লাহর নবী' বলার মাধ্যমে নবীকে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট করে নবী ও তার কথার গুরুত্বকে বাড়ানো হয়েছে। আবার উটনীটি সাধারণ কোন উটনী নয় বোঝাতে 'আল্লাহর উটনী' বলা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সেই উটনী, তার পানি পান ও তার জায়গা সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَحَسَواهَا

১৪. কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং উষ্ট্রীকে জবাই করল। ফলে তাদের পাপের জন্য তাদের রব তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন।

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, উটনীকে হত্যা করার পর সামুদের লোকেরা সালেহ আলাইহিস সালামকে বললো, “তুমি আমাদের যে আযাবের ভয় দেখাতে এখন সেই আযাব আনো।” [সূরা আল-আরাফঃ ৭৭] তখন “সালেহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে বললেন, তিনদিন পর্যন্ত নিজেদের গৃহে আরো আয়েশ করে নাও, তারপর আযাব এসে যাবে এবং এটি এমন একটি সতর্কবাণী যা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। না।” [সূরা হূদঃ ৬৫]

আয়াতে উল্লেখিত دَمْدَمَ শব্দটি এমন কঠোর শাস্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা বার বার কোন ব্যক্তি অথবা জাতির ওপর পতিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ করে দেয়। এখানে فَحَسَواهَا এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, এ আযাব জাতির আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাইকে বেষ্টন করে নিয়েছিল।

৭ম আয়াতে আল্লাহ নাফসকে ভারসাম্যপূর্ণ করে গড়েছেন তা বলেছেন এবং আল্লাহ 'সাওওয়াহা' শব্দটি ব্যহার করেছেন। এখানে ১৪ তম আয়াতের শেষেও আল্লাহ 'সাওওয়াহা' ব্যহার করেছেন যার অর্থ সমান করে দেওয়া,

ভারসাম্যপূর্ণ করে দেওয়া। এখানে আল্লাহ সামুদ জাতির বিশৃঙ্খলা, অবাধ্যতা ইত্যাদিকে মিটিয়ে দিয়ে, ধ্বংস করে জমীনে শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য নিয়ে এসেছেন এমনটি বুঝিয়েছেন।

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

১৫. আর তিনি এর পরিণামকে ভয় করেন না।

দুনিয়ার বাদশাহ ও শাসকদের মতো নন। তিনি কোন জাতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় এর পরিণাম কি হবে, একথা ভাবতে বাধ্য হন না। তিনি সবার ওপর কর্তৃত্বশালী। সামুদ জাতির সাহায্যকারী এমন কোন শক্তি আছে যে তার প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসবে, এ ভয় তাঁর নেই।

ফুটনোট

- এ সূরায় আটটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে।
- পবিত্র হৃদয়ের মানুষ সর্বদা কৃতকার্য হয় এবং কলুষিত হৃদয়ের মানুষ সর্বদা পর্যুদস্ত হয়।
- সালেহ আঃ কে ‘আল্লাহর রাসূল’ এবং উটনীকে আল্লাহর উটনি বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে গুরুত্ব বুঝানোর জন্য
- আল্লাহ মানুষের নফসকে খুবই ভারসাম্যপূর্ণ করে তৈরি করেছেন। অন্যান্য উন্নত সৃষ্টির চেয়ে মানুষের আলাদা বৈশিষ্ট্য হলো মানুষের স্বাধীন নফস আছে। আল্লাহ আমাদের পাশবিক সত্তার মধ্যে নফসের বিশেষ গুনাবলী ঢুকিয়ে দিয়েছেন। পাপ (খারাপ) ও পাপ থেকে বেঁচে থাকা (তাকওয়া) এর ভালো জ্ঞান দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ দেখতে চেয়েছেন যে এই নফস কোন দিকে বেশি ঝুঁকে যায়, কোনটা বেশি গ্রহণ করে।
- ৮ম আয়াতে যেহেতু আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে নফস নেগেটিভ দিকে যেতে পারে তাই সফলতার সর্বদা নিজের নফসের পরিশুদ্ধতা কাজে নিয়োজিত রাখতে হবে। অপবিত্রতা, ময়লা, পাপ থেকে নফসকে পরিশুদ্ধ রাখতে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং নফসকে ধুয়ে মুছে পরিশুদ্ধ রাখার অবিরাম চেষ্টার ফলে তা একসময় পরিশুদ্ধ হবে ইনশাআল্লাহ।
- যে ব্যক্তি নফসের ভালো সম্ভাবনাকে কাজে না লাগিয়ে তাঁকে ধুলায় ফেলে, অবজ্ঞা, অবমাননা করে। সেই ব্যক্তিকে ব্যর্থ বলা হয়েছে।
- সামুদ জাতির উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ যে ব্যক্তি নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তাঁকে ‘সবচেয়ে হতভাগ্য’ বলেছেন।
- ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ ভয়হীন ভাবে তার কাজ করে যান।